Vol. 53 | No. 1 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

তপন রায়চৌধুরীর 'বাঙালনামা'

Volume	53
Issue	1
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	October 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v53i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i1.9
Pages	১৯৯-২১২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

তপন রায়চৌধুরীর *বাঙালনামা*

মোহাম্মদ আজম*

১

তপন রায়চৌধুরীর জীবন আক্ষরিক অর্থেই বর্ণাঢ্য। কেবল বর্ণাঢ্য বললে অবশ্য বেশ কমিয়েই বলা হয়। বলা দরকার, নানা দিক থেকে তিনি ভাগ্যবানও বটে। বেশ কবার বিনয়বশত নিজের যোগ্যতার সাপেক্ষে তুলনামূলক 'বাড়তি প্রাপ্তি'র কথা বলেছেন তিনি। যেসব জাগতিক প্রাপ্তির উল্লেখ করে তিনি বিনয় দেখিয়েছেন, সেগুলো তাঁর ক্ষেত্রে মোটেই বেশি নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা যেসব কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তার সবটা তো ব্যক্তিগত অর্জন নয়। জন্ম, পারিবারিক উত্তরাধিকার, বহু মানুষের জীবনের মোড়-ঘোরানো সময়ে বেঁচে থাকা, রাজনৈতিক বা ক্ষমতাসম্পর্কের অন্তরঙ্গ হতে পারা, এমনকি লেখালেখির উৎসাহ আর ভোক্তা পাওয়া – এগুলো ঠিক ব্যক্তিগত কৃতিত্ব দিয়ে সবটা ব্যাখ্যা করা যায় না। তপন রায়ের ক্ষেত্রে বলা যায়, তিনি সময় ও প্রতিবেশের প্রশ্রয় পেয়েছেন; সাথে সাথে নিজের যোগ্যতা ও তৎপরতায় নিজ সময় ও প্রতিবেশকে তৈরিও করেছেন। তাই এ 'শিক্ষাজীবী'র আত্মজীবনী এত আকর্ষণীয় হয়েছে।

বাঙালনামা বাংলা ভাষার সবচেয়ে সুলিখিত আত্মজীবনীগুলোর একটা। লেখক অবশ্য বলেছেন, এটি 'আত্মজীবনী নয়, স্মৃতিকথা' মাত্র (পৃ. ১০)। একথা বলার কারণও তিনি জানিয়েছেন। খাঁটি আত্মজীবনী লিখতে গেলে ব্যক্তিজীবনের এমনসব অভিজ্ঞতার কথাও লিখতে হয়, সাধারণভাবে যেগুলো জনতার সামনে হাজির করা স্বস্তিদায়ক নয়। যেমন কোনো গোপন অপরাধ বা হীন আচরণের কথা। তবে আত্মজীবনী সম্পর্কে বাংলার বিদ্বৎসমাজে যে কথাটা বেশি চালু, তা হল, বেশিরভাগ আত্মজীবনীতে যৌনজীবনের বর্ণনা থাকে না। কথাটা এভাবে বলা যায়: যা কিছু ট্যাবু হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত তা জীবনীগ্রন্থেও ট্যাবু হিসাবেই থাকে। তপন রায়চৌধুরীও একই কথা বলেছেন। বলেছেন, নিজের গোপন প্রকাশ করে এমনকি বাজারি প্রসার পাওয়ার মতো বুকের পাটাও তাঁর নাই। তাই আত্মজীবনী নয়, স্মৃতিকথাই সই।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে অন্যরকম ভাবনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। উৎপাদক ও ভোক্তা দুই দিক থেকেই। আত্মজীবনী সম্পর্কে বাংলার শিক্ষিতসমাজের পূর্বোক্ত ভাবনা এবং – তপন রায়চৌধুরীর ভাবনাও – যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সত্য বটে, উদারনৈতিক মানবতাবাদী ডিসকোর্সে ব্যক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বরাট আর স্বাধীন ভাবা হত। কিন্তু আজকাল তো আমরা জানি, ভাষা-সংস্কৃতি-শ্রেণি-মতাদর্শের দুর্ভেদ্য জালে ব্যক্তিমানুষ কী সাংঘাতিক রকমে সামষ্টিক। *বাঙালনামা* থেকেই একটা উদাহরণ দেয়া যাক। বিলাত থেকে ফেরার পথে প্রায় অর্ধেক দুনিয়া ঘুরে লেখক ভারতে ফিরেছেন। পথে আরব দুনিয়ার একটা বড় অংশ মাড়িয়ে তাঁকে ভারতবর্ষে ফিরতে হয় (পৃ. ২৫০-৫৩)। পুরা আরব দুনিয়ায় তিনি দেখার মতো বা উপভোগের মতো কিছুই পাননি। ব্যাপারটাকে রায়চৌধুরীর মুসলমান-বিদ্বেষ হিসাবে দেখার অবকাশ নাই। এ বস্তু জ্ঞানত তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। প্রাচ্যবাদী চর্চার ফল হিসাবেও দেখার দরকার নাই। কিন্তু যে শিক্ষা ও রুচির মধ্যে তাঁর জন্ম আর বেড়ে ওঠা, তাঁর দেখার চোখ আর অনুভবের রুচি যেভাবে ভালো-মন্দ নির্ধারণের নিরিখ তাঁর মধ্যে জমিয়ে তুলেছিল, তার ভূমিকা তো অবশ্যই আছে। ধরা যাক, একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান যুবা এ পথ ধরে ভারতবর্ষে ফিরল। মরুপ্রান্তরের ওই বিপুল বিস্তারে কারণে-অকারণে সে কি শিহরিত হবার মতো অসংখ্য উপলক্ষ পেয়ে যাবে না? পাওয়ারই কথা। মানসগড়নের বড় কাঠামো বাদ দিয়ে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবিচার খুব বাস্তবসম্মত হবে না। ব্যক্তির মধ্যে ফারাকটা ঘটে আরো ছোট কাঠামোয়। নীরদ সি. চৌধুরীর সাথে অক্সফোর্ডে পুঁইশাক নিয়ে তাঁর যে বিরোধ বেঁধেছিল (পৃ. ৩৭৩), তাকে সেই ছোট কাঠামোর ফারাক বলতে পারি। বড় কাঠামোর বিচারে তাঁরা দুজন আসলে একই কোঠায় পড়বেন।

আত্মজীবনীতে কী থাকবে আর কী থাকবে না, তার নির্ধারণে সম্ভাব্য ভোক্তার ভূমিকাও বেশ গুরুতর। এখানে ভোক্তা কথাটা অচিহ্নিত বাজার অর্থে দেখাই ভালো। বাজার মানে আবার শুধু বইয়ের কাটতি নয়; যে ধারণা আর বিষয়গুলো জ্ঞানরাজ্যে দাপুটে থাকে, সেগুলোই আসলে সম্ভাব্য ভোক্তার ফর্দটা তৈয়ার করে। এখন যৌনতা বা সেক্সুয়ালিটি যদি তত্ত্বের বাজারে কল্কি না পেয়ে শুধু রসময় গসিপের অংশ হয়, তাহলে, অনুমান করি, আত্মজীবনী-লেখক সে বস্তু উপস্থাপনার ঝুঁকি নেবেন না। কিন্তু যৌনতা যখন রীতিমতো সামাজিক-মানবিক গবেষণার চোস্ত উপাদান হয়ে ওঠে, যখন তত্ত্ববাজির আকর উপাদান হিসাবে বাজারে চড়া-দর হাসিল করে, তখন তা উপস্থাপনের বাড়াবাড়িও ঘটে। এরকম উদাহরণ এই নিরীহ গরিব বঙ্গেও বিস্তর পাওয়া যায়। ব্যাপারটাকে শুধু অর্থকড়ির মানদণ্ডে দেখা সত্যের অপলাপ হবে।

উপরের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এই যে, *বাঙালনামা*কে আত্মজীবনী হিসাবে পড়ার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্তমান আলোচনার জন্য এই চিহ্নায়নের প্রয়োজনও আছে। স্মৃতিকথায়ও ব্যক্তি-লেখকটিকে চিনে নেয়া যায়। কিন্তু আত্মজীবনীতে ব্যক্তির হাজিরা

অনেক জোরালো থাকে। তাই *বাঙালনামা* পাঠসূত্রে খোদ তপন রায়চৌধুরীর ব্যক্তিগত-শ্রেণিগত ভাব-স্বভাবের পর্যালোচনাও উপকারী হওয়ার কথা।

২

যে অভিজ্ঞতাটা তিনি স্রেফ জন্মসূত্রে পেয়েছেন, যে সময়টা ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আনুকূল্যে নিজেই মূল্যবান, তার বিবরণীটা তিনি দিয়েছেন মোটামুটি সামগ্রিকভাবে। তিনি জানেন, এগুলো ঐতিহাসিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। জানেন, এসব ঘটনা বা বাস্তবতার আরো বহু বিবরণীর সাথে পাঠক পরিচিত। জানেন বলেই তাঁর বর্ণনায় দুইটি ঝোঁক খুব পষ্ট। একদিকে তিনি চেয়েছেন, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী তোলা থাকুক, যা হয়ত অন্য দশ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-বিবরণীর একটা হয়ে মূল্যবান হবে। অন্যদিকে ওই অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কে ইতিহাসের অ্যাকাডেমিক সিদ্ধান্তগুলো কিরকম, তারও সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যায়নধর্মী পরিচয় যোগ করেছেন। দুই অংশ মিলে ওই সংক্ষিপ্ত উপাধ্যায়গুলোতে এক ধরনের পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া যায়।

কিন্তু কেতাবের উত্তরভাগে, পরিণত বয়সে নিজের জীবন ও কর্ম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে, তিনি বর্ণিতব্য বিষয়ে খানিকটা লাগাম টেনেছেন। বর্ণনা করেছেন প্রধানত কর্মসূত্রে পাওয়া অভিজ্ঞতা। শিক্ষকতা আর শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা-প্রশাসক হিসাবে অভিজ্ঞতা, আর সামগ্রিকভাবে কর্মসূত্রে-আড্ডাসূত্রে পাওয়া স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এ অংশে গুরুত্ব পেয়েছে। বর্ণনাভঙ্গিতে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। থাকার কথাও নয়। যিনি জানাচ্ছেন প্রেসিডেন্সি কলেজ আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, দিল্লির কেন্দ্রীয় আরকাইভস আর দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকসের অভিজ্ঞতা, আর শেষে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে একেবারে অক্সফোর্ড পর্যন্ত, সেখানেও না থেমে দুনিয়ার নানা প্রান্তের আরো কিছু কুলীন বিদ্যাঙ্গনের খবরাদি – বিষয়গৌরবেই তাঁর তাবত দ্বিধা অন্তর্হিত হওয়ার কথা। তদুপরি বর্ণনাকারী ব্যক্তিটি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ঈর্ষণীয় রকমের লম্বা-চওড়া কেদারায় আসীন। অবস্থানগত প্রত্যয় *বাঙালনামার* সবচেয়ে গুরুতর আকর্ষণ। যতই বিনয় দেখান না কেন, লেখার সময়ে লেখকটি যে বেশ উঁচু আসন থেকেই কথাগুলো বলেছেন, তা গোপন থাকেনি। ভঙ্গিতে মার্জিত রুচি সর্বত্র যে রক্ষিত হয়েছে, তা লিখনশৈলীর মাহাত্ম্য হিসাবেই পাঠ্য।

শুরুটা হয়েছে যথারীতি নিজের জন্ম ও বংশপরিচয় দিয়ে। দেয়ার মতো পরিচয়ই বটে। পিতৃকুল শুধু নয়, তাঁর মাতৃকুলও – দেখা যাচ্ছে – যথেষ্ট পরিমাণে কুলীন। তবে বরিশালের জমিদারবাড়ির ছেলেদের কাছে তাও কল্কে পাওয়ার মতো নয়। যাই হোক, প্রথম দিকে ছোট্ট এক চিলতে পরিচয় আছে কুমিল্লার। তাঁর মামাবাড়ির বর্ণনা। এ বর্ণনা এক হিন্দু ভদ্র পরিবারের। এক সচ্ছল পেশাজীবীর। তবে এর মধ্যে এক

ঐশ্বর্যমণ্ডিত জীবনরীতির স্মৃতিও আঁকা রইল। এ ঐশ্বর্য আর্থিক সচ্ছলতার নিশ্চয়ই; তবে কেবল তা নয়। অন্তত সম্পন্ন হিন্দু পরিবারের খাবার-দাবার আর জীবনযাপনের যে স্মৃতি এখানে তোলা রইল, তা উপন্যাসের বহু বর্ণনাকে বানোয়াট গালগল্পের অপবাদ থেকে রক্ষা করবে।

এরপর যথারীতি বরিশাল। বরিশালের সমকালীন ভদ্রসমাজের যে পরিচয় এখানে আছে, তা সামাজিক গবেষণার মূল্যবান উৎস হিসাবে গণ্য হওয়ার মতো। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার কাছে জমিদারবাড়ির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলো আকর্ষণীয় হওয়ার কথা। জমিদারির অতীত, তার বর্ধিষ্ণু অবস্থা, তার পতনের কালে ভাঙনের শব্দ। তপন রায়চৌধুরীর লেখায় পরিমিতিবোধ বস্তুত অসাধারণ। সেসঙ্গে রসবোধ। দুটিই এ অংশেও পুরামাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিসরেই পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া গেছে। এ অভিজ্ঞতার জোরেই অনেকদিন পরে জমিদারি-ব্যবস্থার ওপর ব্যক্তিগত স্মৃতিনির্ভর এক প্রবন্ধ পড়ে অ্যাকাডেমিক সভায় তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। বাংলা মুলুকের আধুনিক ইতিহাসের গোড়া এই জমিদারি-ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাহেতু এমন কিছু মন্তব্য তিনি করতে পেরেছেন, যা বাইরের কারো পক্ষে কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার জোরে করা সম্ভব হত না। যেমন, বাংলা সাহিত্যে জমিদারশ্রেণির উপস্থাপন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য:

> আয়েসে অভ্যস্ত জমিদারশ্রেণি এক দিকে বংশবৃদ্ধি করেছেন আর অন্যদিকে নায়েব-গোমস্তার হাতে সম্পত্তি দেখাশুনোর ভার ছেড়ে দিয়ে ক্রমে নিজেরা দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছেছেন। এই অবক্ষয়ের ইতিহাস কেউ লেখেননি। তারশঙ্কর-বনফুলের উপন্যাসে জমিদারদের এক রোমান্টিক ছবি তুলে ধরা হয়েছিল, যদিও শেষের দিকের লেখায় তারাশঙ্কর শ্রেণি হিসাবে জমিদারদের অন্তঃসারশূন্যতার কথাই বলেছেন। (পৃ. ১৬১)

এ মন্তব্যে জমিদারি-ব্যবস্থার অংশীদার হওয়ার বাইরে তাঁর সারাজীবনের সাহিত্যপাঠেরও বড় ভূমিকা আছে। অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন জমিদারির আভিজাত্য সম্পর্কে। লিখেছেন, শ্রমশোষক এ শ্রেণিকে অভিজাত বলা ঠিক নয়; বা সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্যের ধরন অন্যরকম ইত্যাদি।

এ ধরনের মন্তব্য-মূল্যায়ন অবশ্য সতর্কতার সাথে দেখাই ভালো। উত্তরকালে বিদ্যাজীবী হিসাবে স্বোপার্জিত আভিজাত্যের সূত্রে কৌলীন্যের যে উঁচু ছাঁদ রোজগার করে নিয়েছিলেন, তাতে ভর দিয়েই বোধকরি এ ধরনের মন্তব্য তিনি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বড়-পরিবারের অন্য সদস্যদের ক্ষেত্রে, অনুমান করি, জমিদারির স্মৃতি এভাবে কালিমালিপ্ত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কথাটার উল্লেখ আসলে সে কারণেও নয়। জমিদার-পরিবারের সন্তান হিসাবে তিনি নিজে যে সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক-

সম্পর্কগত সুবিধা পেয়েছিলেন, তাঁর নিজের বর্ণনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, তার মূল্য মোটেই হেলাফেলার নয়। ফলে জমিদারিজনিত আভিজাত্যকে তিনি যেভাবে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, তা খুব খাঁটি হয়নি। আমরা পরে দেখব, জীবনীর জমিদারি-ব্যবস্থা-সম্পর্কিত পর্যালোচনামূলক অংশগুলোতেও তিনি প্রকৃতপক্ষে খুব গভীরে যেতে পারেননি বা যেতে চাননি।

বরিশালবাসের সময়টাতে অনেকের কাছেই হয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে রাজনৈতিক তৎপরতার বিবরণ। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। কেন্দ্রের নির্দেশনায় বা নির্দেশনা ছাড়াই মফস্বল-শহর-ধরনের প্রান্তগুলোতে সেই আন্দোলন বাস্তবে কী রূপ ধারণ করেছিল, তার সাফল্য-ব্যর্থতার মাপগুলোই বা কেমন – এসবের এক অন্তরঙ্গ ছবি আছে এ অংশে। একটু সতর্কতার সাথে পড়লে বোঝা যাবে, পরবর্তীকালীন অভিজ্ঞতা বা প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-রস ওই বর্ণনায় খানিকটা বাড়তি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। তাছাড়া লেখকের নিজের শ্রেণিগত-রাজনৈতিক পক্ষপাত জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বর্ণনাকে খানিকটা বেশিই প্রভাবিত করেছে। আত্মজীবনীতে এরকমই হওয়ার কথা। এরকম হওয়াই হয়ত ভালো। কিন্তু এ বইয়ের অন্য অনেক বিবরণীর মতো এই অংশেও ঐতিহাসিক নৈর্ব্যক্তিকতার ভঙ্গিটি এত প্রবল যে ব্যক্তিগত মন্তব্যকেও সার্বিক মন্তব্য বলেই মনে হয়। তবে এর ফলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে অংশটির পূর্বকথিত মূল্য মোটেই কমে না।

সে মূল্য শুধু কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিচয়ের জন্যই নয়। অন্য রাজনৈতিক তৎপরতার সংবাদের দিক থেকেও বটে। এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হয়ত শেরে বাংলা ফজলুল হকের তৎপরতা। কয়েকটা রেখায় তপন রায়চৌধুরী ফজলুল হকের ব্যক্তিস্বভাব, মনের গড়ন আর রাজনীতির যে ছবি এঁকেছেন, বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্তের সাথে অন্তরঙ্গ যোগ থাকলেই কেবল তা সম্ভব। বাজারে নতুন আসা মুসলিম লিগের রাজনীতি সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য আছে। তবে সেগুলো সম্ভবত অপ্রচলিত কোনো তাৎপর্য বহন করে না।

'আমাদের প্রজন্ম জাতীয় জীবনের দুই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে – প্রথম '৪৩ সালের মন্বন্তর। দ্বিতীয় '৪৬ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' (পৃ. ১২৬)। – বিশেষ সময়ে জন্মানোর বিশেষ সুফল হিসাবে এই দুই ঘটনার 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' আছে *বাঙালনামায়*। দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় খুব নতুন কথা নাই। তবে, অমর্ত্য সেনের গবেষণার প্রভাবে কিনা বলা মুশকিল, দুর্ভিক্ষ যে সামগ্রিক কোনো বিপর্যয় ছিল না, বরং বহু মানুষের জন্য ভাগ্য গড়ার উপায় হয়েছিল, অর্থাৎ বণ্টনের এবং পরিকল্পনার সমস্যাটাই যে প্রধান সমস্যা ছিল, সেকথা মনে রেখেই তপন রায়চৌধুরী কথাগুলো সাজিয়েছেন। আর, অন্য অনেক ব্যাপারের মতো, এখানেও একটা বাড়তি পাওয়া তেতাল্লিশের মন্বন্তর সম্পর্কে প্রধান গবেষণাগুলো সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী মন্তব্য।

তুলনায় ছেচল্লিশের দাঙ্গা সম্পর্কিত বিবরণ অনেক বেশি আকর্ষণীয়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্পর্শকাতরতা থাকায় দাঙ্গা-বিবরণী তৈরি করা খুব সহজ কাজ নয়। প্রভাবশালী বয়ানে মুসলিম লিগের পাণ্ডা আর সোহরাওয়ার্দীর গুণ্ডাদের দাঙ্গাবাজ হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। তপন রায়চৌধুরীকে অবশ্য তাল সামলানোর জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ঐতিহাসিকের কাণ্ডজ্ঞান আর 'উদারনৈতিক মানবতাবাদী' অবস্থান তাঁকে দোষাদোষির বদলে পর্যালোচনার দিকে নিয়েছে। ফলে দাঙ্গার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেছে এখানে। উৎকৃষ্ট কথাসাহিত্যের মেজাজ আছে এসব মন্তব্যে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' বা খুশবন্ত সিংয়ের *দিল্লি* ইত্যাদি দাঙ্গাকেন্দ্রিক রচনার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *বাঙালনামার* সম্প্রদায়গত সম্পর্কের বয়ান কলকাতার মূলধারার ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে না। স্বভাবতই অনেক পাঠক ক্ষুণ্ন হয়েছেন। তাঁরা লেখককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন: মুসলমানদের তিনি যথোচিত গালিগালাজ করেননি ['নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য]। আসলে কিন্তু লেখকের দিক থেকে মুসলমান-পক্ষের প্রতি আনুকূল্য দেখানোর মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। বরং গালগল্প বাদ দিয়ে কলকাতা-দাঙ্গা সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুতর যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় – প্রাদেশিক সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে – তিনিও সেই প্রশ্ন জোরালোভাবে তুলেছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অসৌজন্য – অধিকাংশ ভাষ্যকার যা করে থাকেন – দেখাননি; কারণ, ওই নথিপত্র, যদি কিছু থেকে থাকে, এখনো গবেষকদের নাগালে আসেনি। সোহরাওয়ার্দী সরকার তথা কলকাতা পুলিশের ভূমিকা, তপন রায়চৌধুরীর মতে, খুবই সন্দেহজনক। অন্যদিকে, আবুল মনসুর আহমদ বা আবদুর রাজ্জাকের মতো বিপরীত পক্ষের বুদ্ধিজীবীদের কাছে এটা কোনো গুরুতর প্রশ্নই নয়। কারণ, আবদুর রাজ্জাকের বরাত দিয়ে *যদ্যপি আমার গুরুতে* আহমদ ছফা যেমন জানিয়েছেন, কলকাতা পুলিশের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা সোহরাওয়ার্দীর কথিত গুণ্ডা হয়ে কলকাতায় হিন্দু-নিধন করেছে – এ সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নয়। তপন রায়চৌধুরী সঙ্গত কারণেই কলকাতার কথিত ভদ্রলোকসমাজের সাংস্কৃতিক মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে, তাঁর মতে, ইংরেজপক্ষ আর প্রাদেশিক সরকারপক্ষের গাফিলতি যে ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

এখানে বলে রাখা দরকার, কংগ্রেস-মুসলিম লিগ রাজনীতি এবং ভারত ও বাংলাভাগ সম্পর্কে মূল্যায়ন পেশের ক্ষেত্রে তপন রায়চৌধুরী উল্লেখ করার মতো বিবেচনাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ বিবেচনা তাঁর স্মৃতিপ্রসূত বলে মনে হয় না। তাঁর সময়ের এবং শ্রেণির মানুষেরা এ ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ গালগল্পের জোগান দিয়েছেন। বাংলাভাষী অঞ্চলে, এমনকি (ছদ্ম)-অ্যাকাডেমিক প্রাঙ্গণগুলোতেও, এসব গালগল্পের প্রবল প্রতাপ প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাগুলোর সাথে পরিচয় থাকায় *বাঙালনামার* তপন রায়চৌধুরী এসব পুরাণধর্মী ইতিহাস থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পেরেছেন।

৩

বাঙালনামার দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের নতুন রাজধানী দিল্লির পরিচয় আছে। এ পরিচয় কিছুটা নগর-পরিকল্পনার দিক থেকে, কিছুটা রাজনীতির দিক থেকে। তবে এ দুই পরিচয় খুবই সামান্য। লম্বা বিবরণ আছে দিল্লির আমলাতন্ত্রের। অল্প কিছুদিন তিনি ন্যাশনাল আর্কাইভসের কর্তাব্যক্তি হিসাবে কাজ করেছিলেন। এই কাজ নেয়া আর কাজ করা – দুই সূত্রে আমলাতান্ত্রিকতার একটা পরিচ্ছন্ন ছবি ফুটেছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করার সময়ে শিক্ষাপ্রশাসন সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাও এই আমলাতান্ত্রিকতার সাথে তুলনীয়। এসব ছবি খুব অন্তরঙ্গ বটে, কিন্তু সুখকর নয়। পাঠকালে কখনো কখনো মনে হতে পারে, দীর্ঘদিন পশ্চিমে সুবিধাজনক জীবনযাপনের ফলে আদর্শ বা মান সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা হিসাবে আত্মস্থ হয়েছে, তারই নিরিখে বুঝি তিনি ভারতবর্ষের ওই গঠনপর্বের পরিচয় দিয়েছেন। সে কারণেই তাঁর চোখে আগের অভিজ্ঞতাগুলো এতটা কালো হয়ে ধরা দিয়েছে।

পুরো *বাঙালনামার*, একদিক থেকে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান উচ্চশিক্ষা আর প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সম্পর্কে বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী। অভিজ্ঞতাটা মুখ্যত ইতিহাস-গবেষণার। সেদিক থেকে ইতিহাসপিপাসুদের জন্য এ এক জরুরি আকরগ্রন্থ। ঐতিহাসিক, ইতিহাসগ্রন্থ, গবেষণাপদ্ধতি, গবেষণার বিষয়, ইতিহাসের বাজার, বাজারের সাথে উৎপাদক-ভোক্তার সম্পর্ক – ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে অজস্র তথ্য আর মূল্যায়নে সমৃদ্ধ এ বিবরণী। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার – শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে অর্থ-মঞ্জুরি, প্রাতিষ্ঠানিক সমুন্নতি রক্ষা থেকে পশ্চিমা ফান্ডের জাহেরি-বাতেনি বিষয়াদি পর্যন্ত – নানাদিকও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। শুরুটা হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রেসিডেন্সি কলেজ দিয়ে। সেখানে আছে কলকাতার বহু বিশ্রুত প-িতের কথা। তারপর তো দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের আভিজাত্য। দুনিয়াজোড়া অ্যাকাডেমিক সম্পর্ক, অ্যাকাডেমির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং রমরমা প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার খুব চমৎকার আভাস আছে এ প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে, বাংলাদেশে যে আবহ সম্পর্কে আমরা সর্বার্থে অজ্ঞ। এরপর অক্সব্রিজের খুঁটিনাটি তো আছেই।

শিক্ষাব্রতীদের কাছে এ বইয়ের আরেকটি দিক খুব আকর্ষণীয় হওয়ার কথা। পুঁজিবাদী দুনিয়ার লিবারেল জমানা থেকে নিও লিবারেল জমানায় প্রবেশ এবং শিক্ষানীতিতে তার প্রত্যক্ষ অভিঘাত। নিজের কর্মকালে তপন রায়চৌধুরীকে অবশ্য এই পরিবর্তনের চাপটা খুব বেশি বইতে হয়নি। কিন্তু লক্ষণগুলো জোরালোভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেতা প্রবলভাবে কাবু করে ফেলছিল অক্সব্রিজের

বনেদিয়ানাকে। সঙ্গত কারণেই এই বাজারি ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখকের অনুকূল মত প্রকাশ পায়নি।

৪

প্রায় যে কোনো আত্মজীবনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সাধারণত এটি লেখা হয় পরিণত বয়সে। জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলো যথেষ্ট পাকা হয়ে যাওয়ার পর। ফলে পেছনে ফিরে পুরানা অভিজ্ঞতার বয়ান একেবারে তখনকার ভাবভঙ্গিসমেত হাজির করা আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব। আত্মজীবনীই বলি আর স্মৃতিকথাই বলি, এ ধরনের লেখার প্রধান অবলম্বন তো স্মৃতি। তথ্য-উপাত্ত না হয় অন্য সূত্র থেকে ঠিক করে নেয়া গেল। কিন্তু ঠিক কোন ঘটনা বা অনুভূতিটিকে লেখক লেখার সময়ে খুঁচিয়ে চাগিয়ে তুলতে চাচ্ছেন, আর সংশ্লিষ্ট স্মৃতির পুনর্নির্মাণই বা কোন কোন উপাদানগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিল, তার সবই তো নির্ভর করে লেখার সময়ের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বলা দরকার, আত্মজীবনী শুধু ইতিহাসই নয়, ইতিহাসের মতোই বানিয়ে তোলা জিনিস। অতীতের বয়সজনিত আর পরিবেশজনিত ভাবটা যদি মুনশিয়ানার সাথে রক্ষিত হয়, তাহলেই পাঠকের জন্য স্বস্তিদায়ক হয়। দুটি কথার ওপর এখানে আলাদা করে জোর দিতে চাই। এক. শব্দটি 'মুনশিয়ানা'; সত্যের নিষ্ঠাবান খোঁজাখুঁজি নয়। 'সত্য কঠিন' বটে আর ভালোবাসার মতো মূল্যবানও বটে, কিন্তু সে যে কোথায় থাকে অন্তত বুদ্ধিমান মানুষ তার হদিশ পাবার আশা করবে না। প্রয়োজনও বোধ করবে না। দুই. স্মৃতি বা নিজের জীবন-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলো যতটা ব্যক্তিগত মনে হয়, আসলে মোটেই তত ব্যক্তিগত নয়। 'নিজের জীবনটাই যাপন করছি' এবং 'নিজের মতোই করছি' – ইত্যাদি চিন্তা শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণির মধ্যে অতি প্রবল। নিজের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এরকম চিন্তা হয়। লক্ষণবিচারে কথাটা মিথ্যাও নয়। কিন্তু অধিকতর গভীর নানা সত্য আমাদের নিশ্চিত করে, ব্যক্তিগত জীবনের বড় অংশটাই আসলে দখল করে থাকে 'অন্য'রা। এটা ভালো বোঝা যায় যখন 'আমার' জীবনের কোনো ঘটনাই অন্যরা ব্যবহার করে ঠিক ওইভাবে যা আমার কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাঙালনামায় 'আত্ম' অংশটা বরং একটু বেশি পরিমাণেই আছে। লেখকের পক্ষপাত আর জোরারোপ এখানে প্রায় বিরামহীন প্রকাশিত হয়েছে। তবে সত্যের খাতিরে বলা দরকার, লেখাটি কথাসাহিত্যধর্মী নয়। কথায় রস আছে যথেষ্ট; সে রস বেশ সুস্বাদুই বটে। চরিত্রের উপস্থাপনায় ব্যক্তিটিকে যথাসম্ভব এঁকে দেয়ার চেষ্টাও আছে। এমনকি কোথাও কোথাও পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈয়ার করে রীতিমতো সংলাপসহ চরিত্রগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বয়ানটাকে কথাসাহিত্যিক মেজাজের বলা যাচ্ছে না।

কারণ, পুরো বইতে একটা নিরাসক্ত দূরত্বের মেজাজ গদ্যভঙ্গির বিশিষ্টতায় রক্ষিত হয়েছে। ব্যক্তিগততার মধ্যে একটা নৈর্ব্যক্তিক সুর প্রধান হয়ে উঠেছে। এটা অন্তরঙ্গতার বিয়োগ নয়; বরং একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির যোগ। সেই ভঙ্গিটা ঐতিহাসিকের। এ কেতাবের লেখক যে একজন ঐতিহাসিক, সে কথা লুকানোর কোনো চেষ্টা তিনি করেননি। নিজের দেখা ঘটনাগুলোকে ইতিহাসের সিদ্ধান্তের সাথে তিনি প্রায়ই মিলিয়ে দেখেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তী ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সাথেও মিলিয়েছেন। নিজের ইতিহাস-গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদেরও। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য আমাদের কথিত ইতিহাসদৃষ্টির মূল প্রমাণ নয়। ইতিহাসের বয়ানে নৈর্ব্যক্তিকতার একটা আবরণ থাকে। থাকতে হয়। ঐতিহাসিক দেখেন খানিকটা দূর থেকে – নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। *বাঙালনামা*র পুরো বর্ণনাটা এই ভঙ্গিতে বলা। পুরো বইটাই মূল্যায়নমূলক। কিছু মূল্যায়ন আবার পাঠক-পাঠিকার বিবেচনার জন্য তুলে রাখা। আর মূল্যায়নটা যেন 'আমার মনে হয়' ধরনের না হয়ে দশের পাতে পরিবেশনের উপযোগী নৈর্ব্যক্তিক হয়, তার চেষ্টাটাও চোখে পড়ার মতো। একদিকে আত্মকথনের অন্তরঙ্গতা, অন্যদিকে ঐতিহাসিকের মেজাজ – দুয়ে মিলে ভঙ্গিটা খুব কাজের হয়েছে।

আত্মজীবনীকে মূল্যবান করে তুলবার জন্য তপন রায়চৌধুরীকে খুব একটা যে কায়কসরত করতে হয়েছে বলে মনে হয় না। নিজের ঊনতার কথা বলে যতই বিনয় দেখান না কেন, বাঙালি বা ভারতীয় পাঠকের জন্য আকর্ষণীয়-অবশ্যপাঠ্য এমনসব ঘটনা-ব্যক্তিসান্নিধ্য-কর্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিজীবনটি কেটেছে যে চাইলেও তিনি একে অনাকর্ষণীয় করতে পারতেন না। লেখার ভঙ্গি বেশি খারাপ হলে বড়জোর পাঠকের বিরাগভাজন হতেন; বর্ণিতব্য বিষয়ের মাহাত্ম্য তাহলেও অক্ষুণ্ন থাকত। এই বিষয়-মাহাত্ম্যের একটা অংশ সময়ের দান। ব্রিটিশ-ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে মুখরোচক সময়ে জন্মেছেন তিনি। কাজ করেছেন ভারত রাষ্ট্রের উন্মেষ-বিকাশের ঐতিহাসিক মুহূর্তের দুই কেন্দ্র কলকাতা আর দিল্লিতে। পরে বিলাতে দীর্ঘদিনের মার্জিত-অভিজাত জীবন। জীবনযাপন আর সান্নিধ্যের যে আভিজাত্যে তাঁর জীবন কেটেছে, তার অর্ধেকটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, বাকিটা নিজের রোজগার। দুটিই ঈর্ষণীয় মাত্রায় উঁচু তানে বাঁধা। তাঁর জীবনকাল যে ইতিহাসের গুরুতর আকর্ষণ, ঐতিহাসিক হিসাবে সে বোধ তাঁর ষোল আনা ছিল। বলেছেনও: 'বর্তমান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য এক লুপ্ত যুগের স্মৃতি পরিবেশন করা, ... ত্রিশ বা চল্লিশের দশকের বাঙালি সমাজের সঙ্গে আমার দৃষ্টিতে আজকের যুগের সমাজের সবচেয়ে বড় তফাত প্রধানত এক বিষয়ে। সে সময় জীবনের নানা ক্ষেত্রে কিছু মানুষ দেখেছি – যাঁরা আদর্শনিষ্ঠায় চরিত্রগুণে অনন্যসাধারণ।...' আবার জীবনের বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতার সৌজন্যে যে অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক আভিজাত্য তাঁর উচ্চারণে-রুচিতে জমে উঠেছে, সে সম্পর্কেও

তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। নিজের মত যথেষ্ট জোরের সাথে উচ্চারণ করেছেন; অন্যের যে মত অপছন্দের, তা জানাতে এক মুহূর্তও দেরি করেননি। কিন্তু দুটিই করেছেন অত্যন্ত মার্জিত ভঙ্গিতে। নিজের অবস্থানকে একবিন্দুও ক্ষুণ্ন না করে অন্যের জন্য যথাবিহিত পরিসর নিশ্চিত করা ব্যক্তির ঔদার্য আর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। সেই অবস্থানকে গদ্যে অনুবাদ করার সাফল্য *বাঙালনামা*র দুর্লভ ঐশ্বর্য।

৫

এই আরামদায়ক 'সাধু' গদ্যে লেখা প্রায় চারশ পৃষ্ঠার ভাষ্য থেকে যদি লেখকের মতাদর্শের হদিশ নিই, যদি দেখতে চাই জীবন-জগৎ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি কী, তাহলে খুব বেগ পেতে হয় না। তিনি রাখঢাকহীনভাবেই একজন লিবারেল হিউম্যানিস্ট – শব্দটির আদি তাৎপর্যেই। ব্যক্তিটি ভারতীয়, আর কর্মসূত্রে বিশ্বনাগরিক – এ দুই তথ্য যোগ করলে সংজ্ঞাটিকে আরেকটু বিশেষায়িত করা হয় মাত্র।

ভদ্রলোক, ভদ্ররুচি এবং ভদ্র জীবনযাপনের প্রতি তাঁর পক্ষপাত কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই প্রকাশ পেয়েছে। এরকম জীবনই যে কাঙ্ক্ষিত তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নাই। বারবার তিনি মানুষের – বিশেষত ভদ্রসমাজের – রুচির ঊনতায় বিস্ময়সূচক বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিপুল মানুষের জন্য এ ধরনের সুরুচির বন্দোবস্ত ঠিক কিভাবে হতে পারে, সে সম্পর্কে উদ্বেগ দেখাননি। কিংবা রুচির সঙ্কট বা খারাপ জীবনযাপন বদলানোর জন্য বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যেও যে কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া উপায় থাকে না, সে প্রসঙ্গ পারতপক্ষে তোলেননি। একবার কেবল, শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে, উচ্চশিক্ষায় বাজেট কমিয়ে নিম্নস্তরে বেশি বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ ধরনের প্রস্তাবও *বাঙালনামায়* যথেষ্ট বিরল। বলা যায়, তপন রায়চৌধুরী গভীরভাবে বিপ্লব বা সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধী। প্রচলিত স্থিতির পক্ষেই তাঁর অবস্থান।

কিন্তু তিনি তো মানুষের কল্যাণ চান। তার উপায় কী? রায়চৌধুরীর কাছে উপায় খুব জটিল নয়। ক্ষমতাসীন বা উঁচু আসনের ব্যক্তিদের ঔদার্যই নানা প্রকারে সঞ্চারিত হবে নিচে। ক্রমশ 'উন্নতি' সঞ্চারিত হবে অধিকতর মানুষের মধ্যে। আদর্শ হিউম্যানিস্ট পদ্ধতি। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বিস্তর সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও গরিব মানুষদের কথা এ কেতাবে নাই বললেই চলে। বরিশালের সামাজিক পরিস্থিতির বর্ণনায় নাই, ভারত-সম্পর্কিত অসংখ্য মন্তব্যের মধ্যে নাই, এমনকি তাবত দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে যেখানে তাঁর জীবনদৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে, সেখানেও নাই। উৎপাদন-বণ্টন সম্পর্কিত জটিলতা অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই ঝানু অধ্যাপকের চিন্তাজগতে প্রায় অধরাই থেকে গেছে।

তাঁর নিজের ইতিহাসদৃষ্টি আর অন্যদের মূল্যায়নেও সে সত্যের প্রবল প্রতাপ। ইতিহাস তাঁর কাছে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সত্য নয়; বরং বিদ্যমান সত্যের পদ্ধতিমাফিক উদঘাটন।

এ কারণেই উত্তর-আধুনিকতা, নারীবাদসহ সব ধরনের ক্রিটিকেল চিন্তা তাঁর বিদ্রূপতার শিকার হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঠাট্টা করেছেন তিনি সাবলটার্ন স্কুল নিয়ে। এ স্কুল যে ভদ্রলোকদের বিষোদগারের একটা প্রক্রিয়ামাত্র, ঠাট্টাচ্ছলে হলেও, তিনি তা জানিয়ে দিতে ভোলেননি। কার্যকারণ সম্পর্ক তিনি নিজেও খোঁজেন। জানেন, ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য সেটাই। কিন্তু তাঁর কার্যকারণ একটা সীমিত গ-ির বাইরে যেতে চায় না। বাংলা বা ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বাঙালনামার উপনিবেশ-প্রসঙ্গ আলাদা মনোযোগ পাওয়ার মতো ব্যাপার। কারণ, তাতে ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে দুনিয়াজুড়ে চালু প্রভাবশালী মতগুলোর একটির প্রতিফলন ঘটেছে। বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যাক, উপনিবেশ-প্রসঙ্গ দৃশ্যত বইটিতে অসংখ্যবার এসেছে। যদি সবগুলো উল্লেখের কাজ-চলতি সারসংক্ষেপ করি, তাহলে বলতে হয়, অনেকগুলো ফলের কারণ হিসাবে তিনি ওই শাসনকে চিহ্নিত করেছেন। ভারতীয় ভদ্রসমাজের দৃষ্টি ও রুচির সংকীর্ণতা পুরো *বাঙালনামায়* লেখকের সবচেয়ে গুরুতর আক্ষেপের বিষয়। এ সংকীর্ণতার কারণ কী? এ প্রশ্নে তপন রায়চৌধুরী কালবিলম্ব না করে উত্তর দেবেন: উপনিবেশিত সমাজের অংশ হয়ে অতি হীনমন্য-দরিদ্র জীবনযাপনে বাধ্য হওয়াই এর কারণ। বস্তুত, এ বাক্য বইটিতে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে নীরদ সি. চৌধুরী সম্পর্কিত পৃষ্ঠা ছয়েকের (পৃ. ৩৬৮-৭৪) উল্লেখ করা যেতে পারে। নীরদ চৌধুরী সম্পর্কে এ এক অন্তর্ভেদী অবলোকন। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং চারিত্রিক অসঙ্গতির দ্বৈত সত্য এখানে উদঘাটিত হয়েছে। কিন্তু নীরদবাবুর চারিত্রিক অসঙ্গতির উৎস কী? তপন রায়চৌধুরী নির্দ্বিধায় বলেছেন, ইংরেজশাসন। কিন্তু তাঁর এ পুনরাবৃত্ত উল্লেখ সম্ভবত খুব গভীর কোনো তাৎপর্য বহন করে না। কারণ, তাহলে এ বইতে অনেকবার এ কথাও উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল যে, যাঁদের বা যে শ্রেণির কথকতায় তাঁর আত্মভাষ্যটি এত মহিমাময় হয়ে উঠল, তাঁরা বা তাঁদের শ্রেণিটি ওই ইংরেজ শাসনেরই প্রত্যক্ষ ফল। অন্য কোনো প্রেক্ষাপটে এরচেয়ে ভালো বা খারাপ কিছু হতে পারত। কিন্তু কিছুতেই এরকম নয়।

ক্রিটিকেল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আসলে তাঁর আত্মজীবনীর মূল প্রকল্পটিকেই সংশয়ে ফেলে দেয়। এ বই পাঠকের জন্য, আগেই বলেছি, অসংখ্য প্রাপ্তির উৎস। কিন্তু ভদ্রজনোচিত বিনয়বশত লেখক বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর জীবন নিজের কথা লিখে বলার মতো মূল্যবান নয়। একটা যুগ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্যই তিনি লিখেছেন। এ যুগটির পরিচয় উদঘাটনে তিনি যথার্থই মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু একবারও প্রশ্ন তোলেননি, কোন পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের বিদ্যামুখী-সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গ পয়দা হতে পারল। কেনই বা পরবর্তী ভারতবর্ষ এ যুগ এতটা দ্রুত হারিয়ে ফেলল। বস্তুত,

পদ্ধতিগত দিক থেকে এ প্রশ্ন তাঁর কাছে কোনো প্রশ্নই নয়। জমিদারি-সংক্রান্ত তাঁর যাবতীয় মন্তব্য সে কথারই সাক্ষ্য। জমিদারির ভগ্নদশা তিনি বর্ণনা করেছেন। উদ্বৃত্তভোগী অসংখ্য মানুষের মননশীল চর্চার উল্লেখও করেছেন। কিন্তু এ প্রথার সাথে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথাটা একবারও বলেননি। বাঙালি ভদ্রলোকদের পরবর্তী ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দিকনির্ণায়ক ভূমিকা তাঁর তাবত আলোচনায় অনুল্লেখিত থেকে গেছে। অথচ, যে প্রশ্নগুলো তিনি উত্থাপন করেছেন, তার প্রায় প্রতিটির সাথে ওই ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। যদি ইউরোপের কোনো সময়খ-কে এ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে পদ্ধতিগত সঙ্কট অনেক কম হবে। কারণ, ইউরোপে সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন বা সমরূপতা অর্জিত হয়েছে শতাব্দী-পরম্পরায়। কিন্তু উপনিবেশিত বাংলা বা ভারতবর্ষের পরিচয় দিতে গিয়ে কাঠামোগত রূপান্তরকে এত কম গুরুত্ব দিলে তাকে কেবল পদ্ধতিগত ভিন্নতা বলে চালানো মুশকিল; দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাই বলতে হবে।

কাঠামোগত প্রেক্ষাপটকে ন্যূনতম গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই পুরো বইটিতে তাঁর মূল অবলম্বন হয়েছে ব্যক্তি। আলোকিত বা সফল ব্যক্তিবর্গ। এঁদের অনেকেই খ্যাতিতে-কীর্তিতে রীতিমত ঈর্ষণীয়। কিন্তু ব্যক্তি-বিবরণীতে কি কালকে ধরা যায়? ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তাঁর ভাবনাজগতে এতটাই একচ্ছত্র যে, অক্সব্রিজে নিওলিবারেল হাঙ্গামাকে তিনি অনায়াসেই ব্যাখ্যা করেন 'মুদিনন্দিনী' মার্গারেট থ্যাচারের ব্যক্তিগত কুকীর্তি দিয়ে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার অন্যায় হামলার দায় থেকে পশ্চিমা ভদ্রসমাজকে বেকসুর খালাস দিয়ে তিনি একক দোষ চাপান বুশের ঘাড়ে। আফগানিস্তানের তালিবান বা ভারতীয় হিন্দু জঙ্গিবাদের প্রতিটি উল্লেখের কালেই তিনি নিজ স্বভাবের বাইরে গিয়ে দেদার গালিগালাজ করেছেন। কিন্তু এই দুই গোষ্ঠীর কুলজি ঘাঁটার জন্য একটা বাক্যও ব্যয় করার দরকার বোধ করেননি। উদারনৈতিক মানবতাবাদীদের সরল কায়দাই বটে!

দৃষ্টিভঙ্গির এই অজটিল সারল্যের সাথে কি শ্রেণিভিত্তির কোনো সম্পর্ক আছে? তপন রায়চৌধুরী নিজে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির মানুষ। বিদ্যাজীবী হিসাবে দেশে-বিদেশে যে জীবন তিনি যাপন করেছেন, তা আর যাই হোক সাম্রাজ্যবাদী প্রতাপশালী বিশ্বব্যবস্থার বিপরীত কিছু নয়। জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক আর নেহেরুর বিশেষ অনুরাগী। ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ তাঁবে বেড়ে ওঠা শ্রেণিটিই স্বাধীন ভারতের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই ব্রিটিশ আমলের চেয়ে স্বাধীন ভারতের নেহেরুর আমল যে অনেক ভালো – এ তথ্য প্রচারের একটা দায় যেন তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এসব বাস্তবতা কি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অধিকতর ক্রিটিকেল হওয়া থেকে তাঁকে বিরত রেখেছে?

৬

দেখা যাচ্ছে, লিবারেল হিউম্যানিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রকট সীমাবদ্ধতাগুলো *বাঙালনামায়* খালি চোখেই পড়া যায়। সুখের কথা, ওই দৃষ্টিভঙ্গির অর্জনগুলো থেকেও এ জীবনীগ্রন্থ মোটেই বঞ্চিত হয়নি। প্রথমেই বলতে হয় ভাষার কথা। এই ভাষা বইয়ের ভাষা, বইনির্ভর সংস্কৃতির ভাষা। বিপুল সংখ্যক পুস্তকবাহিত বাগধারায় শোভিত; কিন্তু বাকনির্ভর স্বরভঙ্গি মোটেই উপেক্ষিত হয়নি। তবে এককভাবে এ ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হাস্যরস। নির্মল হাস্য, ব্যঙ্গ আর বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের অবারিত যুৎসই আমদানি বইটিকে যাবতীয় ভার থেকে রেহাই দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার খাদ্যসংস্কৃতির যে অন্তরঙ্গ পরিচয় এ বইয়ে আছে, তার জুড়ি বোধকরি বাংলা ভাষায় কেবল সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখাতেই মিলবে। ভোজন-রসিক হিসাবে তপন রায়চৌধুরীর খ্যাতি এ গ্রন্থে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দুনিয়ার বিচিত্র খাবারের তুলনামূলক বিবরণ আর সেই বিবরণে প্রায়শই বাংলা মুলুকের উল্লেখ শেষ পর্যন্ত আর শুধু খাদ্যবিবরণীতেই সীমিত থাকেনি, রীতিমতো সংস্কৃতি-অধ্যয়নের তরিকায় উন্নীত হয়েছে। তৃতীয়ত, পর্যটন-উৎসাহী পাঠকের জন্য এ বই বিচিত্র তথ্যের আকর। এদিকটা সম্ভবত অ-তুলনীয় নয়; কিন্তু মূল্যায়নধর্মী মন্তব্যগুলো সমজদার ব্যক্তিত্বের চিহ্নবাহী।

সর্বোপরি, পুরো বইতে বিকীর্ণ হয়ে আছে বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মনোজগতের চালচিত্র। আমরা জানি, পশ্চিমা লিবারেল হিউম্যানিজম তার ইউরোকেন্দ্রিকতার জন্য বিশেষভাবে নিন্দিত হয়ে থাকে। দুনিয়ার বড় অংশকে বাইরে রেখেই এই মতাদর্শের কারবারিরা মানুষ, মনুষ্যত্ব, মাহাত্ম্য আর রুচির নিরিখগুলো প্রজন্ম-পরম্পরায় গড়ে নিয়েছিল। ওই মতাদর্শের এক অপশ্চিমা খাতক হিসাবে তপন রায়চৌধুরী, আমরা আগেই দেখিয়েছি, ক্রিটিকেল দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কোনো পরিচয় দেননি। কিন্তু ব্যক্তিত্ববান মানুষ হিসাবে নিজেদের সংস্কৃতির মূল্যায়নের পাশাপাশি পশ্চিমা সমাজগুলো সম্পর্কেও সজাগ থাকতে চেয়েছেন। সার্বিকভাবে বিশ্বমানবই তাঁর সীমা। কিন্তু বিশেষভাবে বিশেষ জনগোষ্ঠী কী কী আভ্যন্তর লক্ষণে বিশিষ্ট, তার বিস্তর নির্দেশনা *বাঙালনামায়* পাওয়া যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হয়ত তিনি নিজের গবেষক-জীবনের পরম লক্ষ্য হিসাবে বাঙালির মনোজাগতিক ইতিহাস লেখার কর্তব্য নির্ধারণ করেছিলেন।

সে কেতাব তাঁর আর লেখা হয়নি। তবে তার অংশ হিসাবে তিন কীর্তিমান বাঙালির ইউরোপ-বিবেচনার ফিরিস্তি লিখেছেন *ইউরোপ রিকনসিডার্ড* নামে। এখানে একটা শেষ প্রশ্ন তোলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ বইয়ের নামের 'বাঙাল' অংশের কোনো গুণবাচক তাৎপর্য কি আছে? বইতে বেশ অনেকবার লেখক 'বাঙাল' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। *রোমন্থনের* মতো ব্যাপকভাবে না হলেও বরিশালি বাঙালভাষার

ব্যবহারও যথেষ্ট আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'বাঙাল' পরিচয়টা আলঙ্কারিকই থেকে গেছে। লক্ষণীয়, 'আমি বাঙাল' বা 'বরিশাইল্যা বাঙাল' বলে যে কবার তিনি রুখে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন, তার প্রায় কোনোবারই ভেবে-রাখা কথাগুলো উচ্চারণ করেননি – মনে মনে বলেছেন মাত্র। কথাটার প্রতীকী মানে এই দাঁড়ায় যে, বাঙালসত্তার কোনো মটিফ যদি থেকেও থাকে, বাস্তবের তপন রায়চৌধুরীর মধ্যে তা প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হলে, সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, তাঁর প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটত। তবে 'বাঙালসত্তা' বাড়তি উপাদান হিসাবে ফেলনা নয়। অন্তত রঙ্গরসের দিক থেকে। খুব অসচেতন পাঠেই ধরা পড়বে, বাঙালভাষা সর্বত্রই রঙ্গরসিকতার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষার শিল্প-শোভনতার কথা বলা হচ্ছে না। সেদিকটা *বাঙালনামায়* অসাধারণ। কিন্তু বাঙালভাষা এ বইয়ের মূল গদ্যধারায় কোনো অন্তরঙ্গ ছাপ রাখেনি। আর সার্বিকভাবে পুব বাংলার বাঙালের জীবন আর সংস্কৃতির যে ইতিহাস, *বাঙালনামার* সাথে, মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন উল্লেখ সত্ত্বেও, তার প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নাই। এ বই আদতে 'বাঙালিনামা'ই। সব বাঙালি তার অন্তর্গত নয়। উনিশ শতকে কলকাতায় উদ্ভূত, বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত বা নীরদ চৌধুরী-বন্দিত, নতুন বাঙালি এর বিষয়। বাংলার যে অংশেরই বাসিন্দা হোক না কেন, শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ-বিত্তসূত্রে ওই জনগোষ্ঠী মিলেছিল কলকাতার ভূগোলে বা মানস-ভূগোলে; তারপর ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে বা সারা দুনিয়ায়। *বাঙালনামা* ঘোষিতভাবেই এই সফরের আংশিক আমলনামা।